অনন্ত সন্দর্ভবীথি

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

আজ যখন তিনি জঁ-লুক গোদার ৮৪ বছর বয়স পার হয়েছেন, তখন আমরা প্রায় ৫০ বছর আগের তাঁকে স্মরণ করছি কেন? এমন তো নয় যে তাঁর বিষয়ে আমাদের আগ্রহ স্থির-স্থাপত্যে উৎকীর্ণ রয়েছে, বরং এখনও প্রতি মুহূর্তেই তিনি এমন এক অজস্র প্রশ্নমুখরিত একাকী বনস্পতি যে আর প্রমাণ করার দরকার নেই গোদার মানেই বিনোদন-চলচ্চিত্রের বিকল্প প্রস্তাব। একথাও এখন সর্বজনবিদিত যে বিমূর্ততার সমুদ্রে পিকাসো যেমন সাকার কিছুর সংযোগে কোলাজ নামক অঙ্কনপদ্ধতির পত্তন করেন, গোদারও তেমনই চিন্তার অজস্র বাঁক ঘুরে বেড়ানোর ছলে রেখে যান কাহিনিপথের ইঁট-সুরকি। উভয় স্রষ্টাই, হয়তো তাঁদের সঙ্গে ব্রেশট ও ঋত্বিকের নামও যোগ করতে হবে, যা কিছু দৃশ্য বা শ্রাব্য তার চেয়েও অধিক আদরে চুম্বন করেছেন যা কিছু চিন্তনীয় তার ঠোঁটে। পিকাসোর দেমোয়াজেল দাভিগনোঁ যতটা অঙ্কনপদ্ধতি বিষয়ে অঙ্কন, গোদারের চলচ্চিত্র-জীবন ততটাই চলচ্চিত্র প্রণয়ন বিষয়ে দীর্ঘ প্রশ্নমালা। আসলে গোদারের উদ্দেশ্য সফল বা ব্যর্থ ছায়াছবির নির্মাণ নয় বরং এক সন্দর্ভধর্মী নাশকতা যা ধারাবাহিকভাবে চলচ্চিত্রের ভাষাকে পণ্যা স্ত্রীলোকের মতো অসাড় হতে বাধা দেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ১৯৬৬ সালে নির্মিত এই দুটি-তিনটি 'গোপনীয়তা'কে প্রকাশ্যে, রৌদ্রালোকে, জনপরিসরে নিবেদন করে দেওয়া কেন?

একটু মনোসংযোগ করলেই বোঝা যাবে, যে আধুনিকতার সূচনা নতুনের প্রতি এক আগ্রহের, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মার্কস-এঙ্গেলসের 'সাম্যবাদী ইস্তেহার' ও বোদলেয়ার-এর 'পাপের ফুল'-এ, একশো বছর বাদে গোদার সেই সঞ্চারপথের পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করছেন। যে নগরায়ন, মলিন ও জীর্ণ যেসব নরনারী বিকেলের বারান্দার থেকে ঝুঁকেছিল বোদলেয়ারের লেখায়, মার্কস যে নতুনকে চিহ্নিত করেছিলেন ক্রমান্বয়িক অস্থিরতায়, গোদার সেই চলমান অশরীরীকে মূর্ত দেখতে পাচ্ছেন প্যারিসের আবাসন প্রকল্পে। রতিচুম্বনের মধ্যে যে প্রগাঢ় ফাঁক গোদারের ইমেজ দেখায় তার আভাস হয়তো

মার্কসের রচনাতেই ছিল। মার্কস যাকে বলেন অ্যালিয়েনেশন, যা শরীরকে আত্মার থেকে নির্বাসনে পাঠায়, তার সমূহ তাপ গোদারে সংক্রামিত হয়েছে। যে দ্রব্যবশ্যতার কথা এই ছবির নরনারীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা এক উত্থিত ভীতিতরঙ্গ, যাকে বলা যায় আধুনিকতার সারাৎসার : ফ্যান্টাসম্যাগরিয়া।

একদা এথেন্সে পরিভ্রমণরত সক্রেটিস বিপণীগুলি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন—'হায়! জগতের কত জিনিসেই আমার প্রয়োজন নেই'। আর গোদারের ছবিতে জুলিয়েতের প্রয়োজনের সীমা প্রয়োজনের আকারকে ছাড়িয়ে কোথায় যে চলে যায়! পিকাসোর 'আয়নার সামনে তরুণী'-র মতই গোদারের নরনারী জড়পদার্থের সঙ্গে অবিরত সংলাপ করে চলে। গোদার সেই বিধুর বাক্যরাশি আমাদের গোচরে আনেন। এমন দৈনন্দিনতা আমাদের জানা ছিল না। শহরের অন্ত্রে জীবাণুর মতন সঞ্চরণশীল যেসব নারীপুরুষ দোকানে ঝুলে থাকে তারা জুলিয়েত জ্যানসন হতে পারেন কিন্তু গোদারের 'সে' না মারিনা না জুলিয়েত বরং প্যারিস বা সাতটি তারার তিমির। যে শহর দ্যলাক্রোয়ার, গঁগ্যার, মাতিসের, সে শহর ক্রমশ কংক্রিটের বিপণী হয়ে উঠল! আন্তোনিয়নি এই নৈশালোকে ভ্রমণ করেছেন 'লা নত্তে' ছবির অন্তিম কোলাজে নীরবে, কিন্তু গোদার যেন ক্রোধে আকুল হয়ে নথি পেশ করতে চান এবং দেখাতে পারেন যে সৃজনশীলতার বদলে উৎপাদনশীলতা কী করে এক মুখোশ-সভ্যতার পাসওয়ার্ড হয়ে ওঠে এবং জীবন কীভাবে কমিক-স্ট্রিপের মায়াহরিণীদের উলঙ্গ কঙ্কাল হিসেবে পরিবেশন করে। যাদের দীর্ঘশ্বাস নেই ওয়াশিং মেশিন আছে, যাদের প্রণয়লিপ্সা অটোমোবাইল গ্যারেজে থমকে দাঁড়ায়, তাদের আর গোদার ধিক্কার দেন না। এই ছবিটি পুরোপুরি মৃতসমাজের জ্যান্ত দলিল। আর যা গোদারের পক্ষে অবিস্মরণীয় মুদ্রাদোষ—তাঁর এই দেখাকে সম্পাদনা করে রাজনীতি। তিনি দেখতে পান কাগজের বাঘরা মার্কিন রাষ্ট্রপতিনিবাস থেকে মৃগয়া শুরু করার ঘোষণা জানাচ্ছে।

এই পুঞ্জিভূত শব-সমাবেশে জঁ-লুক গোদার সজ্ঞানে গ্রীক পণ্ডিত টাইরেসিয়াসের মতো ফিসফিস করে আমাদের নিয়তির সঙ্গে শলাপরামর্শ করে যান। খেয়ালও করতে চান না যে আমরা ক্লান্তিসীমার পরপারে চলে যাচ্ছি কিনা। কারণ ইতিহাসের সঙ্গে দায়বদ্ধ অপরাধীর মতো তিনি উন্মোচন করে দেন পুঁজিবাদের পরিত্রাণহীন অভিশাপ : অনুভূতিহীনতা, অনুই। আর বলাবাহুল্য তাঁর এই যাত্রা রেনেসাঁ প্রবর্তিত প্রতিরূপায়ণের পথে নয়। এই ছবির কোনো সারাংশ হয় না। তার প্রান্ত কেন্দ্রের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত গোদারের সম্পাদনারীতি ইউরোপীয় স্বভাবের কেন্দ্রাভিমুখিতা সজ্ঞানে বর্জন করে উৎকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এই ছবিতে যে উদ্ধৃতি-সমাবেশ, দৃশ্য-প্রস্রবণে যে অতিরিক্ততা তা বলাবাহুল্য সামান্য চলচ্চিত্রকারের আওতার বাইরে ইতিহাসচেতনতা। যার ফলে

গোদার বুঝতে পারেন তাঁর কাজ নেহাত অভিনব হয়ে ওঠা নয় বরং সভ্যতার বনেদি কুচকাওয়াজের পাশে সামান্য পদাতিক ছন্দ আরোপ করে দৃশ্যের মাত্রা বদলে দেওয়া।

আজকে কলকাতার দর্শকদের সামনে ছবিটি যে ব্যঞ্জনা তুলে ধরবে তা অর্ধশতক আগে আমাদের জানা ছিল না। তখন আমাদের বাসগৃহ আকাশে চুমু খেতে জানত না, তখন আমাদের রাজারহাট ছিল না, নিউটাউন ছিল না। আমাদের বুলডোজারগুলি পূর্ব-কলকাতার দিকচক্রবাল ছিন্নভিন্ন করে দেয়নি। না, শপিংমল, চলমান সিঁড়ি, জাংক খাদ্য, সুরভিত কন্ডোম, অনুমোদিত বেশ্যাবৃত্তি, চিটফাণ্ড কিছুই ছিল না। কলকাতা তখন নাবালক।

সোডিয়াম ভেপারের নীচে সাবালক হয়ে যাবার পরে এই একমেরু পৃথিবীতে আমরা এমন একাকী যে এই ছবিটি হঠাৎ তাঁর নির্মাণ প্রকৌশল বা তাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে চলে গিয়ে আমাদের জানিয়ে দেয় কেমন দু-তিনটে জিনিস যা আমরা জানতে চেয়েছিলাম না। সেই বিচারে কলকাতার নবোদ্গত কনজিউমার সমাজকে দেওয়ার মতো আর কোন উপহার একজন শিল্পী রচনা করতে পারেন যেখানে শহরময় নিরন্তর শবযাত্রা, মাইক্রোওভেন, আইপড ও সেলফি, সেখানে এই ছবিটি দেখতে দেখতে পরতে পরতে আমাদের কারোর হয়তো ক্ষণিকের জন্য মনে হবে ফরাসি এই গালিভারের সামনে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুঁজি-পতঙ্গ কলকাতায় আমরা কতখানি লিলিপুট!

২০১৪